চরিত্রের সাথেও তা ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। বর্তমানে অধিকাংশ সমাজই পুরুষশাসিত সমাজ। অর্থাৎ, এইসব সমাজে পুরুষই (Male Gender) ক্ষমতা ভোগ করে থাকে। পুরুষই নিজ স্বার্থে আইনকানুন রচনা করে, রীতিনীতি তৈরি করে। এই বিষয়ে নারী সমাজ বা Feminine Genddr-এর মতামতকে কোনো গুরুত্ব বা স্বীকৃতি দেয় না। এই দিক থেকে বিচার করে আমরা পুরুষশাসিত সমাজের ক্ষমতায়নকে Coersive Power বলেই ধরতে পারি। কারণ প্রাচীন যুগ থেকেই পুরুষ নিজ স্বার্থে আইনকানুন তৈরি করেছে। এই বিষয়ে নারীর মর্যাদা বা অধিকারকে কোনো গুরুত্বই সে দেয়নি। পুরুষ বা Masculine Gender-এর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সম্মতি বা স্বীকৃতি আদায় করে নিতে পারে নি। সুতরাং, যে ক্ষমতা সে ভোগ করে সে ক্ষমতা অপর শ্রেণিকে বঞ্চিত করে, উপরকে ভুল বুঝিয়ে, অপরের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ভোগ করা ক্ষমতা। তাই সেই ক্ষমতা কখনোই Legitimite নয়। আবার সেই ক্ষমতা ভোগ করতে গিয়ে সে যেহেতু বিপরীত শ্রেণিকে আনন্দ বা মানসিক সন্তুষ্টি দিতে পারে না তাই সে ক্ষমতা Induced Power-ও নয়। এই Power Charismatic Power-ও নয়, কারণ পুরুষ কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বলে সেই গুণের প্রতি আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হয়ে নারী তাকে মেনে চলে না। তাই স্বাভাবিকভাবেই বলা যায়—এই ক্ষমতা Coersive Power বা বলপ্রয়োগমূলক ক্ষমতা। কারণ এই ক্ষমতার বলেই পুরুষ মহিলাকে দমিয়ে রাখে, তার ব্যক্তিত্বকে অস্বীকার করে এবং তাকে সর্বদা নিজের কাজে ব্যবহার করে।

বাল্যকাল থেকেই Gender গত মানসিকতা Construction বা নির্মাণ শুরু হয়ে যায়। Male Child তার বন্ধুগোষ্ঠীর সঙ্গে যেসব Outdoor খেলাধূলো করে থাকে, সে সব খেলাধূলায় সে শক্তি প্রদর্শনের কাজে অভ্যস্থ হয়ে ওঠে। তাই শেষ পর্যন্ত তাদের dominant attitude গড়ে ওঠে। অন্যদিকে কন্যাসন্তান পুতুলখেলা ও অন্যান্য Indoor Game-এ অভ্যস্থ হতে থাকে এবং গৃহস্থালির বিভিন্ন কার্যসম্পাদন ও তার নমনীয় জৈবিক সত্ত্বার বহিঃপ্রকাশের মধ্য দিয়ে নিজেকে Dominated বা Oppressed মানসিকতার অধিকারী করেই গড়ে তুলতে থাকে। অর্থাৎ Male Gender ও Female Gender উভয়ের life orientation টাই হয়ে ওঠে পৃথক পৃথক মূল্যবোধকে কেন্দ্র করে। এই ধরণের সামাজিক নির্মাণের পিছনে আমাদের সমাজের সকল প্রভাবও কম নয়। আমরা ইচ্ছে করেই তাদের এভাবে বড় হতে দিই। তাই ধীরে ধীরে তাদের মানসিকতাও এইভাবেই গড়ে উঠতে থাকে। Male Sex বা পুরুষ ক্ষমতা ও প্রভাব ভোগ করে Masculine Gender-এ পরিণত হয়। মহিলা বা নারী সব ক্ষমতা, প্রভাব ও কর্তৃত্ব হারিয়ে এবং Masculine Gender-এর প্রভাবকে মেনে নিয়ে Feminine Gender-এ পরিণত হয়।

প্রশ্ন

।৬।। নারী সমাজের ক্ষমতাহীনতার কারণগুলি আলোচনা করো।

উত্তর Erik Erickson তাঁর বিখ্যাত 'Psychosocial Development' তত্ত্বে ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশে সামাজিক প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশকে তিনি মানসিক ও সামাজিক উভয় দিক থেকেই আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে ব্যক্তির আচরণের রূপরেখার উন্নয়নে মনস্তাত্ত্বিক বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং জিনগতভাবেই তা নির্ধারিত। বাল্যকালে শিশুদের মধ্যে আত্মসচেতন আবেগসমূহ স্বাভাবিকভাবেই পরিবেশের প্রভাব ছাড়াই বিকশিত হয়। অভিভাবক অভিভাবিকারা বাচ্চার ওপর কোনো নেতিবাচক আবেগের প্রভাব (যেমন—রাগ দেখানো, অপমান করা) না দেখালে বাচ্চারা নিজেদের অত্যন্ত সুখীবোধ করে। প্রশংসা বা খাতির করা হলে তারা ইতিবাচক প্রভাবের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। নেতিবাচক অবস্থার সৃষ্টি করলে তারা মনে করতে থাকে যে তারা অপদার্থ ও মূল্যহীন এবং তারা তাদের কাঙ্খিত কোনো কাজই করতে পারবে না। ফলে তারা ক্রমশই লাজুক ও ভীতু প্রকৃতির হয়ে উঠতে থাকে। Erickson তাঁর তত্ত্বের 'Autonomous Vs Shame and doubt' অংশে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনের এইরূপ ব্যাখ্যাই দিয়েছেন। পারিবারিক ও সমাজ পরিবেশের প্রভাবেই কিশোরীরা দ্বিতীয় ধরণের প্রভাবেই প্রভাবিত হয়। আবার এই

বয়সেই কিশোরীরা অন্যদের প্রভাবকে (চিন্তাভাবনাকে) ভালো করে বুঝতে শেখে। একইসাথে সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটায় কিশোরীরা ভিন্ন ভিন্ন ধরণের সামাজিক অবস্থায় নিজেদের দক্ষতাকে পরিবর্তন করে ও প্রকাশ করে সামাজিক অবস্থার সাথে নিজেদের অভিযোজিত করার জন্য। যেমন—কেউ রাগী হলেও বাড়িতে রাগ দেখালেও স্কুলে রাগ দেখায় না। এইভাবেই তারা নিরাপত্তা পেতে চায় ও বিশ্বাসের পাত্রী হয়ে উঠতে চায়। যারা এটা পারে না তারাই অনুপযুক্ত ও আত্ম-অসন্তুষ্টিতে ভুগতে থাকে। অর্থাৎ, নারী, কিশোরী অবস্থা থেকেই সমাজের কাছে নিজেকে উপযুক্ত প্রতিপন্ন করতে গিয়ে তার ওপর তুলে দেওয়া বা তার জন্য বরাদ্দ করা ঋণাত্মক ও লাজুক অনুভূতিকেই সে মেনে নিতে বাধ্য হয়। কিশোর সমাজের প্রশংসায় যেখানে ধনাত্মক অনুভূতি লাভ করে সেখানে নারী কিশোরী বয়স থেকেই সমাজের Negative, ashamed ও de-pressed orientation-এ অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। ফলে পরবর্তী জীবনেও নারীর মর্যাদা, দক্ষতা ও ক্ষমতা বিশেনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

❖ **Levinson-এর Masculine ও Feminine Social Clock সম্পর্কে ধারণা :**

Livinson তাঁর 'Seasons of Life Theory' তে 'Life Stage' সম্পর্কে বলতে গিয়ে 'Continued inability of Women' বা মহিলাদের ধারাবাহিক সামর্থ্যহীনতা প্রসঙ্গে বলেছেন যে ২০-এর পর থেকে ৩০ বছর বয়স্কা মহিলারা তাঁদের পেশাগত লক্ষ্যকে এড়িয়ে সন্তানের জন্মদান এবং পারিবারিক দায়িত্ব গ্রহণেই বিশেনভাবে উৎসুক হয়ে ওঠে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা পুরুষদের মতো Stability বা স্থায়িত্ব বজায় রাখতে পারে না।

'Social Clock'-এর বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি মহিলাদের 'Femine Social Clock' ও 'Masaculine Social Clock'-এর কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন ২০ থেকে ৩০ বছর বয়সে যেসব মহিলা বিবাহ ও সন্তানের জন্মদানকে বেশি পছন্দ করে তাদের দায়িত্বশীলতা, আত্মনিয়ন্ত্রণ, সহ্যশক্তি ও লালনপালনের দায়িত্ব বেড়ে যায়। এরই ফলে তাদের self-esteem বা আত্মমর্যাদার অবনমন ঘটে। এই ক্ষেত্রে এই প্রকৃতির মহিলাদের ভূমিকাকে তিনি Feminine Social Clock বলে উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে যেসব মহিলা বেশি আত্মনির্ভর (More dominant), সামাজিক (Social) ও স্বাধীন (Independent) থাকতে পারেন তাঁরাই Masculine Social Clock বলে পরিচিত হন। Feminine রা Self-doubt, feelings of incompetence ও Lonliness-এ বা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, অসামর্থ্যের অনুভূতি ও একাকীত্বের বিড়ম্বনায় ভুগতে থাকে। তাছাড়া বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলে 'Multiple Role Dimension' বা বহুমুখী ভূমিকা পালন করতে গিয়ে তাদের হয়রান হতে হয় এবং শরীর ভেঙ্গে যায়, মানসিক অবনমনও ঘটে।

❖ **কারেন হর্নের Social Foundation Gheory of Personality-র দৃষ্টিতে নারী Feminine Gender According to Karen Horney :**

Haren Horney তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Femine Psychology' তে উল্লেখ করেছেন যে শৈশবকাল থেকেই শিশুর মনের ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রাধান্য বিস্তার, অসম্মান, তাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনকে অস্বীকার, শত্রুতাপূর্ণ আচরণ, অতি আদর অথবা অনাদর প্রভৃতি কারণে তাদের মনে Basic Anxiety বাড়তে থাকে। এগুলো তাদের কাছে Basic Evil। এইসব আচরণ তাদের মনে Basic Hostility-র জন্ম দেয়। এই Hostility ও উৎকণ্ঠার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য তারা ৩টি পথ নেয়। (i) Compliance বা বশ্যতা স্বীকার, অসহায়তা ও দোষ পাবার ভয়ে তারা বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছে নতি স্বীকার করে, (ii) Aggresion বা আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠা; বশ্যতা স্বীকারের কাজ না হলে তারা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং রাগে শত্রুর মতো আচরণ করতে থাকে। এ সময়ে তারা নিজের ক্ষমতা প্রকাশ করতে চায়। (iii) Withdrawal বা নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া।

উপরিউক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় পদ্ধতি দুটির মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করতে না পারলে শিশু নিজেকে গুটিয়ে নেয় এবং লুকিয়ে রাখে। ফলে সে লাজুক স্বভাবের হয়ে পড়ে। মেয়েরা দৈহিক ক্ষমতা হীনতার কারণে আক্রমমণাত্মক হয়ে উঠতে পারে না। তাই শেষ পর্যন্ত নিজেকে গুটিইে নেয়।

তাঁর Self Theory তেও তিনি উল্লেখ করেছেন, যারা শেষ পর্যন্ত Self-কে actualise করতে পারে তারাই Real Self ও Ideal Self-এর মধ্যে ব্যবধানকে দৃঢ় করতে পারে। যারা এটা পারে না, অর্থাৎ Ideal Self লাভে অসমর্থ হয় তারাই Neurotic Person-এ পরিণত হয়, লাজুক হয়ে পড়ে, নিজেকে সব ক্ষেত্র থেকে গুটিয়ে নেয় এবং সমাজ থেকেই alianated বা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

Horney-এর এই তত্ত্ব দুটি থেকে একথা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, পরিবারে বংশানুক্রমিকভাবে বঞ্চনার শিকার হয়েই নারী ক্ষমতাহীন হয়ে Feminine Gender-এ পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ তার Nature বা প্রকৃতিটাই হয়েছে Feminine ধরণের।

❖ **নারীর ক্ষমতাহীনতার কারণ :**

ক্ষমতায়নের বিষয়টিকে সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করতে গেল তার পূর্বে সমাজে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব প্রসঙ্গে আলোচনা করা প্রয়োজন। ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে Maciver বলেছেন, "Individuality in the sociological sense is the attribute which reveals the member of a group as more than merely a member. For he or she is a self, a Centre of activity and response expressive of a nature that is his own." অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব হল সমাজের সেই গুণ যার দ্বারা সে নিজেকে গড্ডালিকা প্রবাহ থেকে মুক্ত রাখে এবং গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত থেকেও নিজের ব্যক্তিগত প্রকৃতি অনুযায়ী এবং আত্মকর্মক্ষমতা অনুসারে সামাজিক পরিস্থিতির ওপর স্বকীয় প্রভাব বিস্তার করতে পারে। সমাজে তিন ধরণের লোক আছেন। একদল মানুষ আছেন যারা কোনো বিষয়ের ভালোমন্দ চিন্তা না করে বেশিরভাগ লোক যা বলছে তার অনুকূলেই মত প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় আর একদল মানুষ আছেন যাঁরা নিজের ব্যক্তিত্ব ও অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে ও বিচারবিবেচনা করে এমন মত প্রকাশ করেন যা তার অনুকূল ও প্রতিকূল দু'রকমই হতে পারে অর্থাৎ, যা সমাজের কাছে গ্রহণীয় অথবা নিন্দনীয় উভয় ধরণেরই হতে পারে কিন্তু তাতে তার কিছু যায় আসে না। তৃতীয় আর একদল মানুষ আছেন যাঁরা নিজের মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ যা বলে সর্বদা তার বিরোধীতা করে। তাই Maciver ও Page যথার্থই বলেছেন— 'The degree in which he exhibits the qualities is the degree in which he possesses individuality.'

Socialization বা সামাজিকীকরণ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত দুই মনোবিজ্ঞানী অধ্যাপক R.T. Lapiere ও অধ্যাপক P.R. Fransworth উল্লেখ করেছেন—সামাজিকীকরণ হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা ব্যক্তি মানুষের মানবিক গুণের বিকাশ ঘটে ও যার দ্বারা মানুষ সামাজিক জীবে পরিণত হয়। তবে এটি কোনো 'একটি প্রণালী' বা 'Single Process' নয়। এটি একাধিক বিভিন্ন প্রণালীর সমবায়। অধ্যাপক Kingsley Davis অবশ্য বলেছেন—'It is Unique process of Psychic amalgamation'. অধ্যাপক Ogburn ও Nimcoff বলেছেন, 'যে প্রণালীতে ব্যক্তিমানব শিশু তার নিজ গোষ্ঠীর ব্যবহারিক মূল্যবোধ বা Norm-এর সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয় সেই প্রণালীকে সামাজিকীকরণ বলে।'

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে পরিষ্কার ধারণা করা যায় যে, সামাজিকীকরণের কোনো বিশেষ নিরপেক্ষ প্রণালী নেই। এটি একাধিক প্রণালীর সংমিশ্রণ বা সমবায়। তাই এই প্রণালীর মধ্যে অসংগতি, এমনকি বিরোধিতাও থাকতে পারে। অসংগতি ও বিরোধিতাকে দূর করে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াকে সচল রাখতে পারলে তবেই সমাজ বিকশিত হতে পারে।

জন্মগ্রহণের পর থেকে প্রতিটি সমাজে সামাজিকীকরণ ঘটে লিঙ্গভিত্তিকভাবে। চিরকালের প্রচলিত প্রথা, রীতিনীতি, নিয়মকানুন ইত্যাদির প্রভাব এতটাই বেশি যে নারীকে ভালোমন্দ বোঝার সুযোগটুকুও দেয় না। নারীর প্রভাব আবার এমন নয় যে উপরিউক্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলের মতো মত প্রকাশ করে। তাই শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই তারা প্রথমোক্ত মতেরই অনুগামী হয়ে ওঠে। এর কারণ হল—

১। শারীরিক দুর্বলতা,

২। নমনীয় জৈবিক সত্ত্বা,

৩। অবদমিত হবার মানসিকতা,

৪। পুরুষের প্রতাপ (বাবা ও সমাজের অন্যান্য পুরুষদের প্রতাপ দেখে অর্জিত ভীতি),

৫। নারীর নিজ গোষ্ঠীরই সমালোচনা ইত্যাদি।

জন্মগ্রহণের পর থেকে নারীর এ অবস্থার যদি পরিবর্তন ঘটানো যায় তবে তার সামাজিকীকরণও অন্যভাবেই ঘটবে। ফলে সে ক্ষমতা ভোগ করার যোগ্যও হয়ে উঠতে পারবে। এজন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলো অবলম্বন করা প্রয়োজন।

প্রথমত, কন্যাসন্তানকে বাল্যকাল থেকেই নারীর ক্ষমতা ও প্রতাপ দেখার মতো পরিবেশে বড় করে তুলতে হবে।

দ্বিতীয়ত, কন্যাসন্তানদের ওপরে উল্লিখিত শেষোক্ত দুই ধরণের ব্যক্তিত্বের অধিকারী করে গড়ে তুলতে হবে।

তৃতীয়ত, কন্যা সন্তানদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটানোর জন্য 'Protective Discrimination Policy' গ্রহণ করতে হবে। এর ফলে উচ্চশিক্ষার মধ্য দিয়ে তারা সবকিছুকে ভালোভাবে বুঝতে শিখবে।

চতুর্থত, বর্তমানের 'কন্যাশ্রী'র মতো প্রকল্পে পারিবারিক অর্থনৈতিক আয় একটি প্রতিবন্ধকতাস্বরূপ। কন্যাসন্তানদের প্রকৃত উন্নতি ঘটাতে হলে তাদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলতে হবে এবং এরজন্য কন্যার সাথে বাবা-মার বা পরিবারের সম্পর্ককে দেখলে চলবে না; কন্যাকে রাষ্ট্রীয় সম্পদ বলে গণ্য করেই তার প্রতি সুযোগের ব্যবস্থা করতে হবে।

পঞ্চমত, রাজনৈতিক ক্ষমতা ও সামাজিক মর্যাদাপূর্ণ জায়গাগুলোতে মহিলারা যাতে সহজে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারে তার ব্যবস্থাও করতে হবে।

ষষ্ঠত, যে কোনো মূল্যে কন্যাসন্তানদের ব্যক্তিত্ব গঠনের দিকে নজর দিতে হবে।

প্রশ্ন

৭। নারীর ক্ষমতায়নে নারীর ভূমিকা আলোচনা করো।

উত্তর নারী সমাজের ক্ষমতায়ন ঘটতে পারে কেবলমাত্র কতকগুলো পন্থা অবলম্বনের মধ্য দিয়ে। এইসব পন্থাগুলোকে নিম্নলিখিতরূপে উল্লেখ করা যেতে পারে—

প্রথমত, প্রতিটি নারীকে শপথ নিতে হবে যে, কোনোভাবেই তারা কন্যা ভ্রূণ নষ্ট করবে না বা কোথাও এই ধরণের ঘটনা ঘটলে সম্মিলিতভাবে তার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করবে।

দ্বিতীয়ত, আমাদের সমাজে পুরুষের অনুপাতই বেশি। তাই পুরুষই সমাজে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চরম ক্ষমতা ভোগ করে তাকে। পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষের আধিপত্যকে হ্রাস করতে সমাজে নারী সংখ্যার অনুপাতকে বাড়াতে হবে।

তৃতীয়ত, নারী মাত্রেই বিবাহিতা হতেই হবে—এই ধারণার পরিবর্তন ঘটাতে হবে এবং প্রয়োজন হলে ত্যাগ স্বীকার করে সংসার জীবনের সাময়িক সুখভোগ করার সুযোগকে পরিত্যাগ করে পুরুষশাসিত সমাজের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করার জন্য অবিবাহিত থাকতে হতে পারে। সাংসারিক ক্ষেত্রে নারী জীবনে সুখভোগ খুবই কম সময়ের; বেশিরভাগ সময়েই দুঃখ ভোগ করতে হয়—এই সত্যকেও প্রতিটি নারীকে উপলব্ধি করতে হবে।

চতুর্থত, সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে মহিলা ব্রিগেড গঠন করতে হবে এবং মহিলাদের ওপর যে কোনো ধরণের আক্রমণকে সঙ্গে সঙ্গে তীব্রভাবে প্রতিরোধ করতে হবে। এ বিষয়ে সমাজের প্রতিষ্ঠিত ও উচ্চশিক্ষিতা মহিলাদেরই এগিয়ে আসতে হবে।

পঞ্চমত, দুর্নীতি পরায়ণ পাশবিক শক্তির বৈশিষ্ট্যের অধিকারী পুরুষ নিজের কৃতকর্মের জন্য সর্বদাই ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকে। সে কারণে এমন পুরুষরা আমাদের দেশের মতো দলীয় ব্যবস্থাযুক্ত গণতান্ত্রিক দেশে সর্বদাই

শাসক রাজনৈতিক দল অথবা প্রভাবশালী রাজনৈতিক দল, কিংবা শক্তিশালী কোনো চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী অথবা প্রভাবশালী বা ক্ষমতাশালী ব্যক্তির ছত্রছায়ায় থাকে। নারী সমাজের উপর যে কোনো ধরণের আক্রমণ হলেই সমগ্র নারী সমাজকে দলমত নির্বিশেষে একজোট হয়ে প্রতিবাদে রাস্তায় নামতে হবে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে এই ধরণের বক্তব্য উস্কানিমূলক, কিন্তু নারী সমাজকে বর্বরোচিত আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে এছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। বিবেকানন্দ বলেছেন কেউ কখনও কাউকে সাহায্য করতে পারে না। যে কোনো ব্যক্তির উচিত নিজেই নিজেকে সাহায্য করা। এইভাবে নারীদেরও নিজেদেরই নিজেদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে হবে; পুরুষের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকলে চলবে না।

ষষ্ঠত, বর্তমানে গণতান্ত্রিক ও জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক নীতির দ্বারা পরিচালিত হবার ফলে এবং রাজনীতিতে বহু নেত্রী এগিয়ে আসার ফলে অনেকক্ষেত্রেই মহিলা আসন সংরক্ষণের বিষয়টি উঠে এসেছে। সংরক্ষণের গণ্ডী অতিক্রম করে অর্ধেকের বেশি আসনে যাতে নারী অংশগ্রহণে অগ্রসর হয় সে বিষয়ে নিজেদের স্বার্থরক্ষায় সমস্ত লজ্জা-ভয়-মান ভুলে গিয়ে নারীদের নিজেদেরই এগিয়ে আসতে হবে। যাদের সামর্থ্য আছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেইসব নারীকে সংরক্ষিত আসনের পরিবর্তে সাধারণ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতী করতে হবে। তবেই অপেক্ষাকৃত কম প্রভাবশালী মহিলারা সংরক্ষিত আসনগুলো অধিকার করতে সমর্থ হবে। এইভাবেই অর্ধেকের বেশি আসন অধিকার করতে সমর্থ হলে মহিলারা। মনে রাখতে হবে যে, রাজনৈতিক ক্ষমতাই সামাজিক ক্ষেত্রের মূল নিয়ন্তা। তাই মহিলাদের আগে রাজনৈতিক ক্ষমতাকে কায়েম করতেই হবে।

সপ্তমত, আমাদের দেশে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার যে রীতি প্রচলিত আছে দা দীর্ঘদিন ধরে শুধুমাত্র নারী শরীরকে ভোগের সামগ্রী হিসেবেই দেখে এসেছে; তার তেজ দেখেনি। পুরুষ কখনও ভাবে নি যে, নারীকে সে ভোগের বস্তু হিসেবে দেখে এসেছে সে নারী দেবী দুর্গা বা কালীর রূপ নিয়ে পুরুষকে পায়ের তলাতেও রাখতে পারে। যদি নারী তার তেজদৃপ্ত এই মূর্তি দেখায় তবে দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা পুরুষের শাসন, শোষণ ও অত্যাচারের মরচে পড়া শৃঙ্খলটা অনায়াসেই ভেঙ্গে পড়বে। সময় ও সুযোগ নারীর সামনে এসেছে। প্রয়োজন উপযুক্ত নেতৃত্বের মাধ্যমে ক্ষমতার সদ্ব্যবহার।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, কোনো নারী যখন প্রেমিক বা নায়কের বক্ষলগ্না হয় তখন তার কাছে জগৎ প্রেমময়। সে অবস্থায় সে কল্পনাও করতে পারে না যে সুযোগ পেলেই তার প্রেমিক পুরুষটি তার ওপর তার মনের কোণে লুকিয়ে রাখা প্রতিহিংসার তীক্ষ্ণ নখর বসিয়ে দিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধাবোধ করবে না, এই চিন্তা তখন সে নারীর মাথায় থাকে না বলে সে নিজের নারী জাতির প্রতি শত্রুতামূলক আচরণও করে। অনেক সময় নারীর ঐক্যবদ্ধ ভূমিকাকেও সে উপহাস করে। কিন্তু যখন সে পুরুষের দ্বারা প্রত্যাখাত হয় অথবা তার ওপর নেমে আসে পুরুষের তীক্ষ্ণ নখরের আক্রমণ, তখনই সে উপলব্ধি করে যে সে ইতোমধ্যেই সব হারিয়ে বসে আছে; তার আর কিছুই করার নেই ! তাই এভাবে পুরুষের কাছে নিজেকে বিকিয়ে না দিয়ে আগেভাগেই সতর্ক থাকতে হবে যাতে পুরুষের আক্রমণের শিকার তাকে না হতে হয়।